মনুষ্যত্বের আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রবন্ধসাহিত্য

অভিজিৎ মাইতি

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ গৃহী ভক্ত বলরাম বসু একবার আক্ষেপ করে সংশয়িত মনে স্বামী বিবেকানন্দকে একটি চিঠিতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এত সাধুসেবা করে জীবনে আসল লাভ কী হল। উত্তরে স্বামীজী লিখেছিলেন, ''...যে স্থান ছাড়িয়া আসিয়াছেন সে দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবেন—ছিলেন গরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর।''[১] এই মন্তব্যটি অনুধাবন করলে মানুষের জীবনের তিনটি স্তর পাওয়া যায়—পশুত্ব, মানবত্ব এবং দেবত্ব। মানুষ জন্মসূত্রে মানুষই, পশু নয়। কিন্তু পাশবিক যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনও প্রাণীকে আমরা পশু বলে চিহ্নিত করে থাকি, একজন মানুষের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি যখন প্রধান হয়ে ওঠে তখন তাকে আমরা পশু বলেই চিহ্নিত করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গল্পের শুরুতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, ''মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা।''[২] অর্থাৎ সভ্যতার বিবর্তনে মানুষের যে-বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষকে আমরা মানুষ বলে চিনি তার ভিতরে কিন্তু লুকিয়ে আছে পশুর নানা বৈশিষ্ট্য। সেই লুকোনো বৈশিষ্ট্যগুলির এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য বাইরে প্রকট হলে মানুষ পশু হয়ে ওঠে। এমন লুকিয়ে থাকা পশুর সন্ধান করেছে আধুনিক সভ্যতাও। সাহিত্যের আন্দোলনে দেখা যায় ন্যাচারালিস্টরা মানুষের biological instinct-কে অনাবৃত করে দিতে চেয়েছিলেন। মানুষের অন্তর্গত পশুত্বকেই একমাত্র সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন Dadaism-এর প্রবক্তারা। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু কোনওদিনই মানুষের ভিতরের ওই পশুত্বকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করেননি। তিনি পরবর্তী পর্যায়কে দেখেছেন যেখানে মানুষের পরিচয় আছে তার মনুষ্যত্বে এবং মানুষের শেষতম পরিচয় তার দেবত্বে। কিন্তু ওই দেবত্বকে অর্জন করতে হলে আগে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে। স্বামী বিবেকান্দের প্রবন্ধে এই মনুষ্যত্ব অর্জনের পথগুলি বর্ণিত হয়েছে এবং দেবত্বের পথ নির্দেশিত হয়েছে। একথা ঠিক, তাঁর আলোচনার সমকালে ভারত পরাধীন। আজকের ভারতের সঙ্গে সেই ভারতের অনেক তফাত। কিন্তু স্বামীজীর নির্দেশিত পথ

চিরন্তন, চিরকালের গ্রহণযোগ্য।

'হিন্দুধর্ম কি?' [স্বামীজী প্রদত্ত এই শিরোনামটি বর্তমানে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে প্রচলিত] প্রবন্ধে স্বামীজী হিন্দুধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বললেন, বর্তমানে ভারতের অবনতির কারণ সৎশাস্ত্র, সদাচার ত্যাগ করে লোকাচারে নির্ভরতা, বৈরাগ্যহীনতা, ক্ষীণবুদ্ধি, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা, সন্দেহ, দাসজাতির মতো ঈর্ষাদ্বেষ।[৩] ফলে 'তমোগুণে' ভরে গেছে ভারত। 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধেও তিনি ভারতের চতুর্বর্ণ কাঠামোর প্রাসঙ্গিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখালেন কীভাবে উচ্চবর্ণের স্বার্থপরতা আর নিম্নবর্ণের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা ভারতকে নির্বীর্য করে তুলেছে। ফলে ভারতের সর্বত্র 'শূদ্রত্ব' অবস্থান করছে। লক্ষণীয় এখানে 'শূদ্র' আর কেবল পারিভাষিক শব্দ রইল না, বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হল। ভারতব্যাপী এই 'শূদ্রত্বে'র কারণ সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরে তমোগুণের বিস্তার, বৈরাগ্যের ছলনায় অকর্মণ্যতা, তপস্যার ভানে নিষ্ঠুরতা। এই সামগ্রিক অধঃপতন থেকে রক্ষা পেতে তিনি উচ্চারণ করলেন 'স্বদেশমন্ত্র'; প্রার্থনা করলেন : ''হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।''[৪]

এই 'মানুষ' হওয়ার জন্য স্বামীজী সমকালীন ভারতবর্ষে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের সদ্‌গুণের সমন্বয় চাইলেন এবং প্রাথমিক কর্তব্য স্থির করে ভারতবাসীর মধ্যে চাইলেন, ''আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ''[৫]—যেমনটা ছিল গ্রিক জাতির মধ্যে এবং তাদের বর্তমান বংশধর ইউরোপের মধ্যে। অতএব এখন দরকার উদ্যম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মনির্ভরতা, অটল ধৈর্য, কার্যকারিতা, একতাবন্ধন, উন্নতিতৃষ্ণা, পিছনের দিকে দৃষ্টি ছেড়ে সামনের দিকে তাকানো।[৬] 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা'-তে স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদান-প্রদান চেয়েছিলেন। সেই আদান-প্রদান কেমন হতে পারে তার একটি প্রায়োগিক রূপ তিনি তুলে ধরলেন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-র মধ্যে।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সুষ্ঠু সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে স্বামীজী মানুষের মধ্যেকার তিনটি স্তরকে দেখেছেন—''মানুষের মধ্যে আছেন, আমাদের মতে, তিনটি জিনিস। শরীর আছেন, মন আছেন, আত্মা আছেন।''[৭] তাঁর বিচারে এই তিনটি পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল এবং এক-একটি জাতির মূলগত বৈশিষ্ট্য এই তিনটির পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বস্তুত কোনও জাতিকে বুঝতে হলে সেই জাতির মূল বৈশিষ্ট্য বা মেরুদণ্ডকে সর্বপ্রথমে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তিনি পৃথিবীর তিনটি জাতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরলেন তুলনামূলক পদ্ধতিতে—''রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড'' এবং ''ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ—ইংরেজের আসল কথা।'' এই দুই সভ্যতার বিপরীতে তিনি আবিষ্কার করলেন ভারতীয় সভ্যতার 'প্রাণভ্রমরা'কে, ''এখন বুঝতে পারছ তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখিটি কোথায়?—ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে।''[৮]

স্বামীজী এই তিন জাতিকে কাছ থেকে দেখেছেন বলেই শুধু এদের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরলেন তা নয়, সমগ্র পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতিগুলির দুটি প্রধান প্রবণতাকে তুলে ধরলেন—জীবনের প্রতি বহির্মুখী দৃষ্টি এবং অন্তর্মুখী দৃষ্টি।

মনোজগতের এই দুই প্রবণতা কীভাবে বাইরের জীবনকেও প্রভাবিত করেছে তার অনুসন্ধান স্বামীজী শুরু করলেন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে, পূর্বকথিত মানুষের মধ্যের তিনটি স্তরের প্রথমটির অর্থাৎ শরীরের এবং শরীর সম্বন্ধীয় অন্যান্য জিনিসের

ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। শরীরের প্রতি আত্যন্তিক প্রীতি থেকেই মানুষের ইহজাগতিক ভোগসুখ আহরণের যাবতীয় প্রয়াস। সেই প্রয়াস সর্বাধিক প্রকাশিত হয় নিজেকে সাজিয়ে তোলার বাসনায়। মানুষের পোশাক ও ফ্যাশন কীভাবে সমগ্র পৃথিবীতে মানবীয় জীবনধারা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নির্মাণে সহায়ক হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন স্বামীজী। শরীরের সঙ্গে পোশাক-আশাকের যোগ বাইরের কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও আহার-পানীয়ের যোগ ভিতরের। দুই প্রবণতার কারণে দুই সভ্যতার বাইরের আচরণেও অদ্ভুত পার্থক্য। নানা উদাহরণ দিয়ে সেই পার্থক্যের কথা বলেছেন স্বামীজী। একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করলেই সমগ্র বক্তব্যের সার বোঝা সম্ভব হবে—''কিন্তু তফাত দেখ! আমরা স্নান করি কেন?—অধর্মের ভয়ে; পাশ্চাত্যেরা হাত-মুখ ধোয়—পরিষ্কার হবে বলে। আমাদের জল ঢাললেই হল, তা তেলই বেড়-বেড় করুক আর ময়লাই লেগে থাকুক।''[৯] আসলে, ''হিঁদু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতি—সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে!''[১০] অতএব দরকার উভয়ের ভালগুলোর সমন্বয়।

এইসব ভালর মধ্যে শারীরিক দিক থেকে অন্যতম স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে পাশ্চাত্যবাসীরা আমাদের দেশের থেকে অনেক বেশি সুখী। অতএব তাদের স্বাস্থ্যসচেতনতা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। স্বামীজীর নজর এড়ায়নি পরিবর্তমান যুগপরিবেশে বাঙালির খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও তার ফলাফল। চিরাচরিত স্বাস্থ্যকর খাবার ছেড়ে মুখরোচক খাবারের প্রতি বাঙালির ঝোঁক স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই যে রজোগুণসঞ্চারী শরীর তিনি চেয়েছিলেন তার উপযোগী খাদ্যাভ্যাস তৈরির দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজের হাতেই; আজকের ভাষায় 'ডায়েট চার্ট' তৈরি করলেন। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ উক্তিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মূল বক্তব্যগুলি পেশ করলেন। নিরামিষ ও আমিষের দ্বন্দ্ব বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত, ''যার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ; আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারের দিবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বইকি।''[১১] নিরামিষাশীদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল সম্বন্ধে সার কথা ''শর্করা-উৎপাদক (starchy) খাবার রোগের ঘর।''[১২] আধুনিক বাঙালির ময়দা, তেলের খাবারের দিকে ঝোঁক দেখে সাবধান করলেন—''ময়রার দোকান যমের বাড়ি।''[১৩] অবশ্যই ''অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ।''[১৪] খাদ্য সম্বন্ধে মোটকথা, ''এখন সর্ববাদিসম্মত মত হচ্ছে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয়, এমন খাওয়া দাওয়া।''[১৫] এমনকী তিনি রুটি, ভাত, ডাল, তরকারি, শাক, মাছ, মাংস, দুধ প্রভৃতি খাদ্যের গুণাগুণ ও খাওয়ার পদ্ধতি নিয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন। স্বামীজীর এই মতামতের সঙ্গে অনায়াসে মিলিয়ে পড়া যায় আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষের খাদ্যের বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকে, ''সেইজন্য খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান সকলেরই থাকা দরকার। কোন খাদ্যের কি গুণ তাহা না জানিলে দেহ রক্ষার জন্য, পুষ্টির অথবা রোগব্যাধির প্রতিষেধের জন্য কি কি খাদ্য কতটা পরিমাণে খাওয়া আবশ্যক তাহা আমরা বিচার করিতে পারিব না। বিচার করিয়া ও বাছিয়া খাদ্য না খাইলে আমাদের দেহের শক্তি ক্ষয় হইবে, কর্মশক্তি কমিয়া যাইবে, অথবা কোনও বিশেষ খাদ্যগুণের অভাবের জন্য অসুখবিসুখে আমরা ভুগিতে থাকিব।''[১৬]

ভারতে প্রাচীন কাল থেকে খাদ্য গ্রহণ প্রচলন ছিল স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে এবং অন্তর্জীবন গঠনের উপযোগী করে। প্রমাণ, ''শঙ্করাচার্যের মতে 'আহার' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়জ্ঞান আর রামানুজাচার্যের মতে ভোজ্যদ্রব্য। সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, দুই অর্থই ঠিক।''[১৭] কেননা কুখাদ্য

শরীরের অসুস্থতার কারণ এবং ইন্দ্রিয় যথাযথ কাজ না করলে ধর্মজীবনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

ফলে ভারতবাসীর যাবতীয় কাজ-কর্ম-আচার-ব্যবহার-প্রচেষ্টার মূলে আছে অন্তর্জীবনের অধ্যাত্ম বা ধর্মানুভূতির প্রচ্ছায়া। যেমন পাশ্চাত্য জাতিগুলির সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে আছে বহির্জীবনের দিকে দৃষ্টি। একারণে বিজ্ঞানের জন্য (science) তাদের এত অধ্যবসায়। স্বামীজী কেবলমাত্র অন্তর্জাগতিক অধ্যবসায়ে সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছেন না। তিনি পাশ্চাত্যের বহির্জাগতিক অধ্যবসায়কেও চাইছেন। সেজন্যই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর স্ত্রীর প্রচেষ্টায় বিশ্বসভায় ভারতের নাম যেভাবে উজ্জ্বল হয়েছে তা আবেগকম্পিত কণ্ঠে বর্ণনা করেছেন 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে।[১৮] কিন্তু সমস্যা হল, আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার যে-ধারাটি গড়ে উঠেছিল, যে-বিজ্ঞানের চর্চা প্রাচীন ভারতে অধ্যাত্মসাধনার পাশাপাশি চলেছিল, সেই ভারতবর্ষের আধুনিক সংশয়ী মন ধর্ম আর বিজ্ঞানের আপাত পার্থক্যের মধ্যে মানবীয় প্রচেষ্টার বিপ্রতীপ দুটি ধারা লক্ষ করেছিল। কেবল ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র আধুনিক পৃথিবীই বিজ্ঞানচর্চায় ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাকে পরিত্যাজ্য বলে মনে করেছিল। যেমন পুরনো দিনে পাশ্চাত্য ধর্মবিশ্বাসীরা বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে মেনে নিতে পারেনি। এক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের গোঁড়ামির উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছেন, ''ইওরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই ক্রিশ্চানধর্মের বিপক্ষে বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি ইওরোপে ক্রিশ্চানীর শক্তি থাকত, তাহলে পাস্তের (Pasteur) এবং 'কক' (Koch)-এর ন্যায় বৈজ্ঞানিকসকলকে জীবন্ত পোড়াত এবং ডারউইন-কল্পদের শূলে দিত।''[১৯]

কিন্তু বাইরের পার্থক্যকে বড় করে তুলে উভয়ের এই লড়াই আসলে উভয়ের চরম অগ্রগতিকেই অসম্পূর্ণ রেখে দিতে পারে তা সম্পূর্ণ ভাবতে পারেনি আধুনিক বুদ্ধি-মননে ঋদ্ধ পৃথিবী। এখানেই স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা স্থাপন করতে চাই। তাঁর ভাবনায় এই আপাত বিপ্রতীপতার দ্বন্দ্ব একটি সুষম ঐক্য পেয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতির যা কিছু বৈশিষ্ট্য সবই আসলে এক মহাশক্তির খেলা : ''অগ্নি তো এক, প্রকার বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে। কিন্তু এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দী-কতক নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তারই প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ।''[২০] এজন্যই ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মূলে কোনও পার্থক্য নেই। ১৮৯৬ সালের একটি চিঠিতে জানা যায়, অদ্বৈতজ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিষয়ে একটি বই লেখার কথা ভাবছিলেন তিনি। যদিও সে বই লেখা হয়নি কিন্তু বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি এ-বিষয়ে তাঁর চিন্তা প্রকাশ করেছেন।[২১] স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী 'Swami Vivekananda Synthesis of Science and Religion' প্রবন্ধে (বঙ্গানুবাদ—স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধর্ম ও বিজ্ঞান) দেখিয়েছেন কীভাবে স্বামীজীর ব্যাখ্যায় উক্ত দুই বিদ্যা মিলিত হয়েছে একক সংহতিতে। রঙ্গনাথানন্দজী আধুনিক পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, মনস্তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখার বৈজ্ঞানিক জেমস জিনস, আর্থার এডিংটন, প্রিন্স লুই দ্য ব্রগলি, লিঙ্কন বার্নেট, পিয়ারসন, স্যার জুলিয়ান হাক্সলি প্রমুখের উদ্ধৃতি তুলে দেখিয়েছেন কীভাবে এঁরা বিশ্বরহস্যের অভ্যন্তরীণ রহস্যের সামনে অবাক হয়েছেন; বিশ্বরহস্যের থেকেও গূঢ় মানবরহস্য কেমন করে এঁদের ভাবিয়েছে, মানুষের ক্রমবিকাশে আধ্যাত্মিকতার অবস্থান অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।[২২] স্বামীজী 'হিন্দুধর্ম কি?' প্রবন্ধে পঞ্চ

ইন্দ্রিয় দ্বারা সংকলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলেছিলেন আর অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তি দিয়ে গ্রাহ্য জ্ঞানকে 'বেদ' বলেছিলেন।[২৩] আলোচ্য 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে তিনি অদ্বৈতবাদ আর বিজ্ঞানের মধ্যে অভিন্নত্ব ব্যাখ্যা করলেন, ''যে পরিণামবাদ ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি, এখন সে পরিণামবাদ ইওরোপী বহির্বিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে।" অর্থাৎ এখন বহুর মধ্যে থেকে এককে খোঁজা শুরু হয়েছে এবং ''তা সে এক কেমন করে 'বহু' হল, এ-কথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি যে ওখানটা বুদ্ধির অতীত, এরাও তাই করেছে। তবে সে 'এক' কি কি রকম হয়েছে, কি কি রকম জাতিত্ব ব্যক্তিত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় এবং এটার খোঁজের নাম বিজ্ঞান (Science)।"[২৪]

স্বামীজীর ব্যাখ্যায় ভারতের এবং পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি মিলিত হল। দুই গোলার্ধের দুই সভ্যতার দুই ধরনের দৃষ্টি যে-মন থেকে বিকশিত হয়েছে সেই মন শরীরের ওপরে বিরাজ করে এবং সেই মনের যথাযথ বিকাশে মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। বিজ্ঞান, সুসভ্য সমাজব্যবস্থা, আহার-পানীয়-পোশাক-আশাক, রীতিনীতি যা কিছু মানুষের সৃষ্টি তা তো পশুর থেকে মানুষের ভিন্নত্বকে চিহ্নিত করে এবং শরীরের ঊর্ধ্বে মনের ক্রিয়াশীলতাতেই প্রতিক্ষেত্রে সেই ভিন্নত্ব নির্মিত হতে থাকে। তাই মানুষের শরীরের পরবর্তী উন্নত স্তর মন।

কিন্তু শরীরের চাহিদা পূর্ণ না হলে মনুষ্যত্বের কথা বলা বৃথা। সমস্যা হল বহু প্রাচীন কাল থেকে ভারতের অন্তর্মুখী জীবনচর্চা এবং কালে ইহজগতে ভোগসুখ আহরণের প্রতি অবহেলা ভারতকে ইহজগতে দুর্বল করে দিয়েছে—ধর্মজগতেও ক্রমশ বিপথগামী করেছে। রজোগুণের মধ্য দিয়ে না গেলে একজন মানুষ সত্ত্বগুণে উপনীত হতে পারে না। ভোগ না করলে ত্যাগ করা সম্ভব নয়।[২৫] ভারতের মীমাংসকদের মতো করে স্বামীজী প্রথমটিকে বললেন 'ধর্ম', দ্বিতীয়টিকে বললেন 'মোক্ষ'। প্রাচীন ভারত মানুষের এই কর্মশক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছিল বলেই ধর্মের মধ্য দিয়ে, ইহজগতে ভোগসুখ আহরণের মধ্য দিয়ে অন্তিমে মোক্ষে পৌঁছতে চেয়েছে। পরবর্তী কালে বৌদ্ধরা ধর্মকে উপেক্ষা করে মোক্ষলাভের দুরাকাঙ্ক্ষায় জাতিকে হীনবীর্য করেছে। স্বামীজী জানেন 'মোক্ষ'প্রাপ্তিই মানবজীবনের শেষ কথা কিন্তু তার আগে 'ধর্ম' অর্জন করার মাধ্যমে 'মোক্ষ'প্রাপ্তির সামর্থ্য অর্জন করতে হয়। সেই সামর্থ্য অর্জনের জন্য আধুনিক যুগের উপাসনামন্ত্র হওয়া উচিত শ্রীকৃষ্ণ কথিত তমোগুণনাশী মন্ত্র, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ...' ইত্যাদি। আচার্য শংকর, রামানুজের কর্মমার্গ তাই তাঁর দ্বারা অভ্যর্থিত। স্বামীজী পুরাণের উদাহরণ দিয়ে দেখালেন কীভাবে কর্মোদ্যোগের জন্য অসুর ভোগসুখ আহরণে এত উৎসাহী। এই অসুরদেরই আধুনিক বংশধর পাশ্চাত্যবাসীরা। আর ভারতবাসীরা 'দেবতার বাচ্চা'। অতএব অসুরদের মতো বা পাশ্চাত্যবাসীদের মতো 'মনিষ্যি' হতে হবে আগে।[২৬]

প্রশ্ন, যে-তমোগুণ থেকে স্বামীজী ভারতবাসীকে রজোগুণে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, আজ সেই রজোগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতবাসী। তাহলে এখন তো আর প্রাসঙ্গিক নয় তাঁর মানুষ হওয়ার নির্দেশ! উত্তর, এখানেই আসে স্বামীজীকৃত মানুষের মধ্যেকার তিনটি বিভাগের শেষ বিভাগটির প্রসঙ্গ—'আত্মা'র প্রসঙ্গ। প্রথমে মনে রাখতে হবে তিনি পাশ্চাত্যের সদ্‌গুণগুলি ভারতীয় জীবনে চেয়েছিলেন কিন্তু পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে পাশ্চাত্যবাসী হয়ে ওঠার কথা বলেননি। কারণ মনুষ্যত্ব অর্জনেই মানবজীবনের সম্ভাবনাকে তিনি সীমাবদ্ধ করে দিতে চান না। তিনি সোনার বাক্সয় কোহিনুর রাখার পক্ষপাতী। [স্মর্তব্য, হিন্দু ছেঁড়া

ন্যাতায় কোহিনূর রাখে আর বিলাতি সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে।[২৭]] তাই তিনি শরীর, মনের উন্নতির মধ্য দিয়ে 'আত্মা' বা মানুষের অভ্যন্তরীণ দেবত্বের বিকাশকেই চরম মনে করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে মনুষ্যত্ব অর্জনের পথটি প্রধান হয়ে উঠলেও ওই দেবত্বের বিকাশের প্রতিই তাঁর অন্তিম লক্ষ্য।

উনিশ শতক যখন মানবতাবাদ নিয়ে চর্চা করেছে তখন মানুষের প্রতিষ্ঠাটাই মানবতাবাদীদের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল। সেই প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব পেয়েছিল মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের প্রসঙ্গ। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব মানুষের মনের মধ্যে লুক্কায়িত নানা জৈব প্রবণতাকে অবশ্যম্ভাবী বলে প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই ভাবনা সমগ্র পৃথিবীকে মানুষের জৈবসত্তাকেই অনিবার্য বলে ভাবতে শিখিয়েছিল। বিভিন্ন সাহিত্য আন্দোলনে মানুষের অন্তঃস্থ পিশুনতাগুলি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি মানুষের জীবনে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এনে দিয়েছিল, শুধু কেড়ে নিতে শুরু করেছিল প্রাণের আবেগ। দুটি বিশ্বযুদ্ধে মানুষ অবাক বিস্ময়ে মানুষের হাতে মানুষের নিধনলীলা প্রত্যক্ষ করে হতাশ হয়ে উঠেছিল। মানবতাবাদের সমস্ত আদর্শ মানুষে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হয়ে অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল, মানুষের ওপর চরম বিশ্বাসের মূল্য কি এতই ভয়াবহ? কেউ কেউ মনে করেছিলেন আধুনিক পৃথিবীতে 'বুড়ো ঈশ্বরটা' মারা গেছে। সভ্যতার অগ্রগতি হতে হতে মানুষ বর্তমানে এসে পৌঁছেছে ভোগবাদী এমন এক উত্তর-আধুনিক সভ্যতায় যেখানে মানুষ ক্রমশ চিহ্নিত হচ্ছে 'কনজিউমার' হিসাবে। ধনী আর দরিদ্রের তফাত আরও বেশি ব্যবধান দৈরি করছে সামাজিক জীবনে। ভোগের বিলাসিতায়, ভোগের অতৃপ্তি মানুষকে পৌঁছে দিচ্ছে চরমতম অবসাদে। আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। পেশীশক্তির আস্ফালন ভীতি তৈরি করছে সর্বত্র। সমস্ত কিছুর মধ্যে যুক্তির, অধিকারের নামে সংশয়িত দৃষ্টি ভাঙন ধরাচ্ছে সামাজিক-পারিবারিক সম্পর্কে। এভাবে নানা নেতিবাচকতা আমাদের এ-অত্যাধুনিক সভ্যতায় এক 'অদ্ভুত আঁধারের' জন্ম দিয়েছে।

এখান থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মনে রাখতে হবে স্বামীজীর নির্দেশিত পথগুলি। অন্যকে বিচার করতে হবে নিজের অবস্থান থেকে নয়, তার অবস্থান থেকে—''প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র—ভাষা মাত্র।''[২৮] বুঝতে হবে ভোগের একমাত্র অধিকার মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—''প্রথম বুঝতে হবে যে, এমন কোন গুণ নেই, যা কোন জাতিবিশেষের একাধিকার।''[২৯] নিজের ইহজাগতিক উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনাকে শ্রমে-ঘর্মে অর্জন করতে হবে এবং অন্য কেউ যখন একই চেষ্টা করবে তখন তাকেও যথাসাধ্য সাহায্য করতে হবে—''সত্য, সত্য, পরম সত্য—স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর।''[৩০] অনুভব করতে হবে একা বাঁচা সম্ভব নয়। সকলের উন্নতিতেই নিজের মঙ্গল লুকিয়ে আছে—''তোমাদের মুখে চুনকালি পড়লে যে আমার মুখে পড়ে, তার কি''[৩১] এবং ''মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ও-সব বাকি আপনা-আপনি গড়গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর।''[৩২] শিক্ষা, বুদ্ধি, মেধার দৌলতে সাফল্যের সিংহাসনে বসে ভুললে চলবে না, ''...ভোগ বলে যা খুঁজছ তা আছে শান্তিতে; শান্তি আছেন শারীরিক ভোগ-বিসর্জনে; ভোগ আছেন মননশীলতায়, বুদ্ধিচর্চায়; শরীরচর্চায় নেই।''[৩৩]

এভাবেই স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে প্রাপ্ত নির্দেশগুলিকে উত্তর-আধুনিক সভ্যতায় মানবজীবনের নবীনতম ভাষ্যের সূত্র হিসাবে

আবিষ্কার করা সম্ভব। শেষে স্মরণ করতে হবে মানবজীবনে সেই মহাশক্তিকে, যে-''মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে।''[৩৪] যে-মহাশক্তির খেলা নিজের মধ্যে আবিষ্কার সম্ভব হলে 'পরমধ্যানাবস্থা'[৩৫] প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনক রাজার মতো 'আত্মবিৎ'[৩৬] হয়ে সংসার করা যায়।

এ যদি সম্ভব না হয় তাহলে রজোগুণে প্রতিষ্ঠিত উত্তর-আধুনিক আমাদের সভ্যতা কর্মের সংঘর্ষে কেবল অগ্নি উদ্‌গীরণ করতে করতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবে আদিম পশুত্বে। সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের পৈশুন্যের পরিচয় বিরল নয়। এভাবেই স্বামীজীর দর্শন মানুষকে আংশিক পরিচয়ে সীমাবদ্ধ রাখে না, মানুষের মধ্যেকার অনন্ত সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দিতে চায়। আজকের সভ্যতার বিচারবুদ্ধি-মনন-দর্শন যখন মানুষের যাবতীয় মূল্যবোধের ভাঙনপাড়ে দাঁড়িয়ে মানব-অস্তিত্বের সংকটকে বড় করে দেখছে তখন মানবের পৃথিবীতে দেবতা হয়ে ওঠা এক আত্মবিৎ মানুষের নিঃসংশয় ঘোষণার স্মরণ ভিন্ন গত্যন্তর নেই—''হইবেন দেবতা ও ঈশ্বর।'' এ কেবল একজন ব্যক্তিকে দেওয়া একটি পরামর্শমাত্র নয়, এ আসলে পৃথিবীর সমগ্র মানবসভ্যতার যাবতীয় সংশয়ের একটি নিরাময়মন্ত্র। ✠

তথ্যসূত্র

১। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), খণ্ড ৬, পৃঃ ২৪৪ [এরপর, *বাণী ও রচনা*]

২। *রবীন্দ্ররচনাবলী* (বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ : কলকাতা, ১৩৯৭), খণ্ড ১২, পৃঃ ৪০৫

৩। দ্রঃ *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৬ (*হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ*), পৃঃ ৩-৫

৪। তদেব (*বর্তমান ভারত*), পৃঃ ১৯৪

৫। তদেব (*উদ্বোধনের প্রস্তাবনা*), পৃঃ ২৬

৬। তদেব

৭। তদেব (*প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*), পৃঃ ১২৮

৮। তদেব, পৃঃ ১২৪-১২৫

৯। তদেব, পৃঃ ১৩৩

১০। তদেব, পৃঃ ১৩৪

১১। তদেব, পৃঃ ১৩৭

১২। তদেব

১৩। তদেব, পৃঃ ১৩৮

১৪। তদেব, পৃঃ ১৩৯

১৫। তদেব, পৃঃ ১৩৮

১৬। বিনয় ঘোষ, *সমাজবিদ্যা প্রবেশিকা* (জি ই এজেন্সি : কলকাতা, ১৯৬০), পৃঃ ২৭

১৭। *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৬ (*প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*), পৃঃ ১৩৫

১৮। তদেব (*পরিব্রাজক*), খণ্ড ৬, পৃঃ ৯৭

১৯। তদেব, পৃঃ ১৬৬

২০। তদেব, পৃঃ ১২৬

২১। তদেব, খণ্ড ৭, পত্রসংখ্যা ২৫৮, পৃঃ ১৮২

২২। দ্রঃ সম্পাদনা স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ* (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার : কলকাতা, ২০১২), পৃঃ ৪৯২-৫১৯

২৩। দ্রঃ *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৬ (*হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ*), পৃঃ ৩

২৪। তদেব (*প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*), পৃঃ ১৫৫-৫৬

২৫। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১২০

২৬। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৩২

২৭। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৩৪

২৮। তদেব, পৃঃ ১১৮

২৯। তদেব, পৃঃ ১১৯

৩০। তদেব, পৃঃ ১২০

৩১। তদেব, পৃঃ ১২৪

৩২। তদেব, পৃঃ ১২৭

৩৩। তদেব, পৃঃ ১৬৩

৩৪। তদেব, পৃঃ ১২৫-২৬

৩৫। তদেব, পৃঃ ১২১

৩৬। তদেব, পৃঃ ১৬৩